রাজনীতি কী বিচিত্র, কংগ্রেসে প্রণব ছিলেন প্রণম্য, আজ অচ্ছুৎ

রাজনীতি সত্যিই বিচিত্র। বিশেষ করে ভারতবর্ষে। প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধির সময় থেকে প্রণব মুখোপাধ্যায় ছিলেন জাতীয় রাজনীতিতে চাণক্য। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি বারবার নিজের দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন সংসদে এবং সংসদের বাইরে কংগ্রেসের ঝানু নেতা হিসাবে। এমনকী তিনি যে দেশের রাষ্ট্রপতি পদ অলংকৃত করেছিলেন তাও কংগ্রেসের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট সোনিয়া গান্ধির আশীর্বাদে, এটা কারও অজানা নয়। পাঁচ বছর দেশের রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন প্রণব মুখোপাধ্যায় নতুন ঢঙে, সব বিতর্কের ঊর্দ্ধে থেকে। বিশেষ করে সহিষ্ণুতা এবং ধর্ম নিরপেক্ষ ভারত প্রশ্নে প্রণবের বার্তা সারা দেশে প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু সেই প্রণব মুখোপ্যাধ্যায়ের আমন্ত্রিত হয়ে সগৌরবে নাগপুরে আরএসএসের অনুষ্ঠানে যাওয়া নিয়ে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা প্রণবকে কার্যত কোণঠাসা করছেন। কারণ আরএসএস নয়। এর বড় কারণ আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত প্রণবকে ভবিষ্যতে প্রধানমন্ত্রী রূপে তুলে ধরতে চান বলেই গুজব, যদিও এর কোন সত্যতা এখনও পর্যন্ত নেই। তবুও কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধির দেওয়া ইফতার পার্টিতে প্রণব আমন্ত্রিত নন। বলে প্রচার হয়েছিল, কিন্তু পরে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানান হয় যে প্রণব মুখোপাধ্যায় ওই ইফতারে আমন্ত্রিত, তবে এ নিয়ে জল অনেক ঘোল হয়েছে। এতে কী বার্তা যাচ্ছে সমাজে তা আগামিদিন বলবে।

রাহুলের দেওয়া ইফতার পার্টির অনুষ্ঠান হবে ১৩ জুন। দিল্লির এক পাঁচতারা হোটেলে।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

"সাধুসঙ্গে শান্তি হয়; জলে কুম্ভির অনেকক্ষণ থাকে; এক একবার জলে ভাসে নিশ্বাস লবার জন্য। তখন হাপ ছেড়ে বাঁচে!"

[যাত্রাওয়ালা ও ঈশ্বর 'কল্পতরু'-সকাম প্রার্থনার বিপদ]

যাত্রাওয়ালা -আঞ্জা, আপনি ভোগের কথা বলেন, তা ঠিক। ঈশ্বরের কাছে ভোগের কামনা করলে শেষকালে বিপদে পড়তে হয়। মনে কতরকম কামনা বাসনা উঠছে, সব কামনাতে ত মঙ্গল হয় না। **ঈশ্বর কল্পতরু**, তার কাছে যা কামনা করে চাইবে তা এসে পড়বে। এখন মনে যদি ওঠে **ইনি কল্পতরু**, আচ্ছা দেখি বাঘ যদি আসে। এখন মনে যদি ওঠে ইনি কল্পতরু, আচ্ছা দেখি বাঘ যদি আসে।' বাঘকে মনে করতে বাঘ এসে পড়ল; আর লোকটাকে খেয়ে ফেল্লে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-হাঁ, ঐ বোধ হয় বাঘ আসে।

"আর কী বলব, ঐদিকে মনে রেখো, ঈশ্বর কে ভুলো না-**সরল ভাবে তাকে ডাকলে তিনি দেখা দিবেন।**"

"আর একটি কথা-যাত্রা শেষে কিছু হরিনাম করে ওঠো। তাহলে যারা গায়এবং যারা শুনে সকলে ঈশ্বর চিন্তা করতে করতে নিজ স্থানে যাবে"। যাত্রাওয়ালা প্রানাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহস্থাশ্রমের জন্য ভক্ত-বধূগণর প্রতি উপদেশ]

দুটি ভক্তদের পরিবারেরা আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। তাহারা ঠাকুরকে দর্শন করতে আসিয়াছেন, এই জন্য উপবাস করিয়া আছেন। দুই জা অবগুন্ডবতী, দুই ভাইয়ের বধূ। বয়স ২২/২৩-এর মধ্যে, দুই জনেই ছেলের মা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বধূদিগের প্রতি)-দেখ, তোমরা শিব পূজা করো। কি করে পূজা করতে হয় 'নিত্যকর্ম', বলে বই আছে ,সেই বই পড়ে দেখে লবে। ঠাকুর পূজা করতে হলে ঠাকুরের কাজ আনেকক্ষন ধরে করতে হবে। ফুল তোলা চন্দন ঘষা, ঠাকুরের বাসন মাজা, ঠাকুরের জলখাবার সাজান, এই সকল করতে হলে ঐ দিকেই মন থাকবে। হীন বুদ্ধি, রাগ, হিংসা এ সব চলে যাবে। দুই জায়ে যখন কথাবার্তা কইবে, তখন ঠাকুরদেরই কথাবার্তা কইবে।

দিনপঞ্জিকা

২৯ জ্যৈষ্ঠ, ভাঃ ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩ জুন, ২৯ জেঠ, সংবৎ ১৫ জ্যৈষ্ঠ বদি অধিক, ২৮ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৪।৫৫, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৯। বুধবার, **অমাবস্যা** রাত্রি ঘ ১।৫২ মিঃ। রোহিণীনক্ষত্র অপরাহ্ণ ঘ ৫।১৮ মিঃ। ধৃতিযোগ দিবা ঘ ৯।৪৭ মিঃ। চতুস্পাদকরণ, দিবা ঘ ২।৫৩ গতে নাগকরণ, রাত্রি ঘ ১।৫২ গতে কিন্তুঘ্নকরণ। **জন্মে**- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, অপরাহ্ণ ঘ ৫।১৮ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, শেষরাত্রি ঘ ৪।৩৬ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। **মৃতে**-দোষ নাই। **যোগিনী**-ঈশানে, রাত্রি ঘ ১।৫২ গতে পূর্ব্বে। **কালবেলাদি** ঘ ৮।১৬ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১১।৩৭ গতে ১।১৮ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ২।১৬ গতে ৩।৩৬ মধ্যে। **যাত্রা**-শুভ উত্তরে দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ, অপরাহ্ণ ঘ ৫।১৮ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ঘ ১।৫২ গতে পুনঃ যাত্রা শুভমাত্রা উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**- নাই। **বিবিধ**-অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিন্ডন। **অমাবস্যার ব্রতোপবাস ও নিশিপালন**। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। **গোস্বামিমতে পুরুষোত্তম মাস ব্রত সমাপন। রাত্রি ঘ ১।৫২ গতে মলমাস নিবৃত্তিঃ (সমাপ্তি)। মুখ্যচান্দ্র জ্যৈষ্ঠ শুক্লপক্ষ হিন্দি শুদ্ধ জ্যৈষ্ঠ সুদি আরম্ভ। মহাপুরুষ শ্রীঁহরিদেবের তিরোভাব মহোৎসব (অসম)। অমৃতযোগ**-দিবা ঘ ৭।৩৮ গতে ১১।১৩ মধ্যে ও ১।৫৪ গতে ৫।২৯ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৯।৫৪ মধ্যে ও ১২।১ গতে ১।২৫ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২৯ জ্যৈষ্ঠ, ভাঃ ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩ জুন, ২৮ রমজান, ২৯ জেঠ, উঃ ৪।৫৪, অঃ ৬।১৭, বুধবার, অমাবস্যা রা ঘ ১।৫১, সেহ্‌রী শেষ ৩।১৮, ইফ্‌তার ৬।২৬।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরি জীবন

আট

২৪ পরগনায় দ্বিতীয়বার

বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ

১০ই এপ্রিল ১৮৮৮-এ বঙ্কিমচন্দ্রকে আলিপুরে অস্থায়ী ভাবে আনা হল। ১৮৮৮-৮৯ এর প্রেসিডেন্সী ডিভিশনের প্রশাসনিক প্রতিবেদনে ২৪ পরগণার কালেক্টর মিষ্টার গ্রিমলে বললেন, "একজন সচেতন ও পরিশ্রমী অফিসার।" কমিশনার মি. স্মিথ তাঁকে 'ভাল' বললেন। এরপরে অবসর গ্রহণের সময় পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র স্থায়ী ভাবে আলিপুরে বিচার বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৮৯-৯০-এর বার্ষিক রিপোর্টে জেলার কালেক্টর মি. ফরবেস বললেন, "একজন সুযোগ্য অফিসার, যিনি নিজের কাজ পুরোপুরি বোঝেন এবং সন্তোষজনক ভাবে তা সম্পাদন করে থাকেন।" কমিশনার মিষ্টার স্মিথ তাঁকে 'ভাল' বললেন।

আগেই দেখা গেছে বিচার বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে ইংরেজ আইনজীবী ও বিচারপতিদের সঙ্গে তাঁর তর্ক-বিতর্ক লেগেই থাকত। শচীশচন্দ্র একটি মকদ্দোমার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে আলিপুর আদালতে দেখেছেন যে, একজন সাহেব ব্যারিস্টার বঙ্কিমবাবুর এজলাসে এমনভাবে চলেছেন যেন, "একটা নগণ্য নেটিভ ডেপুটির সঙ্গে অবধানতার সহিত বক্তৃতা করিবার প্রয়োজন নাই।"[২৫] কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সেই সাহেবকে মামলা পরিচালনার পদ্ধতিগত ত্রুটি সংশোধন করে সঠিক ভাবে সওয়াল করতে বাধ্য করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ক্যারেক্টার বুক-এ ২৪ পরগণার জেলা জজ মি. গ্যারেট এর একটা প্রতিবেদন উদ্ধৃত করা আছে। এই জেলার কয়েকজন সাব অর্ডিনেট ম্যাজিস্টেরিয়াল অফিসারের সবিশেষ গুণ ও যোগ্যতার কথা বলতে গিয়ে মিষ্টার গ্যারেট মন্তব্য করেছেন যে, সে বছর বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাসে যে ৬৭ জন আপীল আবেদনকারীর শুনানী হয়েছিল, তারমধ্যে ২১ জনের আপীল খারিজ করা হয়েছিল, ২২ জনের শাস্তি বহাল রাখা হয়েছিল, ১১ জনের শাস্তির মেয়াদ কমানো হয়েছিল এবং ১১ জনের রায় উল্টো করে দেওয়া হয়েছিল।

মামলার রায় সংশোধনের জন্য ১৩ জনের দরখাস্ত বিচার করা হয়েছিল, যার মধ্যে ১ জনের আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়, ৩ জনের শাস্তি বা আদেশ নামা অপরিবর্তিত রাখা হয় এবং একজনের আবেদন পুনঃরায় তদন্তের জন্য ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর মি. গ্যারেট লিখেছেন, "এই অফিসার খুব যত্নের সঙ্গে মামলার বিচার করেন; তবে তার রায়ে কাজের থেকে কথা থাকে বেশী এবং কখনো কখনো বিচারের সময় তিনি অসাধারণ মতামত ব্যক্ত করে থাকেন। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে আমি তাঁর কাজে সন্তুষ্ট।"

১৮৯০-এর রিপোর্টে ২৪ পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. বোল্টন মন্তব্য করেছেন, "একজন পুরাতন ও অভিজ্ঞ অফিসার, যিনি মহকুমার অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ মকদ্দোমার বিচার সম্পূর্ণ করেছেন এবং তা ভালভাবেই করেছেন।"

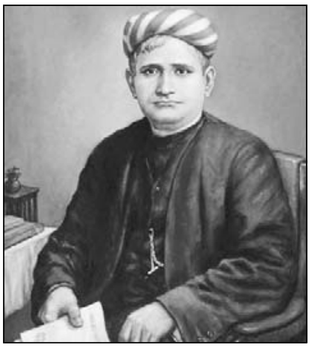

১৮৯০ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩২ বছর বঙ্কিমচন্দ্র ডেজিগনেশন (পদের নাম) ছিল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর। তিনি এ পদের ষষ্ঠ ধাপে শুরু করে প্রথম ধাপে উন্নীত হয়েছিলেন; প্রথম পাঁচটি ধাপ অতিক্রম করতে সময় লেগেছিল ১২ বছর ৩ মাস ১৯ দিন, কিন্তু ষষ্ঠ ধাপটিতে লেগেছিল দীর্ঘ ১৪ বছর ১ মাস ৫ দিন। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, চাকরির শেষ দিকে তাঁকে কতটা নেতিবাচক পরিস্থিতির ভিতর কাজ করতে হয়েছিল। দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি এই তিক্ত উপলব্ধির কথা প্রকাশ করে লিখেছেন,"কাহারও কাহারও কাজে সহস্র গুণ থাকিলেও কৃষ্ণবর্ণের দোষ যায় না। পুরস্কার দূরে থাক, শেষাবস্থায় দীনবন্ধু অনেক 'লাঞ্ছনা প্রাপ্ত' হইয়াছিলেন।"[২৬] তাঁর নিজের ক্ষেত্রে 'আনন্দমঠ' প্রকাশের পর থেকে পদাবনতি, অপমান, হয়রানির বদলি এবং সাহেবদের সঙ্গে নিরন্তর বাদ-প্রতিবাদ লেগেই ছিল। চাকরির শৃঙ্খলে এমনভাবে আবদ্ধ থাকায় শিশির কুমার দাস তাঁর গবেষণা গ্রন্থের শিরোনাম লিখেছেন, দ্য আর্টিস্ট ইন্ চেইনস ঃ দ্য লাইফ অব বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী বা শৃঙ্খলিত শিল্পী ঃ বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জীর জীবনকথা।[২৭]

এক সময় যে সব তরুণ ইংরেজ অফিসার বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে শিক্ষানবিশী করেছিলেন, চাকরি জীবনের শেষের বছরগুলিতে তারাই তাঁর উপরওয়ালা হয়ে বসেন। এঁরা অনেকেই তাঁকে অবজ্ঞা করতেন। তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করে মজা লুটতেন।[২৮] তাছাড়া তাঁর সাহিত্য-সাধনা তাঁর কর্মকুশলতার যোগ্য মর্যাদা পাবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর এই চাকরি। তাই শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে তিনি একদিন বলেছিলেন, "চাকরী আমার জীবনের অভিশাপ।"[২৯]

শচীশচন্দ্র লিখেছেন, "বঙ্কিমচন্দ্র যেমনই দক্ষতার সহিত কাজ করুন না কেন, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত তাঁহার কোন মতে বনিল না। অবশেষে তিনি কার্য্য হইতেও অবসর গ্রহণ করিবার বাসনা করিলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পেনসনের দরখাস্ত করিলেন।"[৩০] তখন তাঁর তিপান্ন বছর বয়স, পেনশনের বয়স অর্থাৎ পঞ্চান্ন বছর হতে তখনও দু'বছর বাকি। বলিষ্ঠ ও নিরোগ শরীর; তাই তাঁর দরখাস্ত মঞ্জুর হল না। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বাংলার ছোটলাট স্যার চার্লস অ্যালবার্ট ইলিয়ট-এর (১৮৯০-১৮৯৫) স্মরণাপন্ন হলেন। এই ইলিয়ট পরিবারের সঙ্গে তাঁর পূর্ব পরিচয় ছিল। লেডি ইলিয়ট-এর অনুরোধে তিনি 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করে সেই পাণ্ডুলিপি তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। ছোটলাট এক সাক্ষাৎকারে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিপ্রায় যে সুচিন্তিত তা জেনে তাঁর অবসর গ্রহণের দরখাস্ত মঞ্জুর করলেন। তখন অবসর গ্রহণের পর সরকারী পেনশন পুরো পেতে গেলে তেত্রিশ বছর চাকরি করা ছিল বাধ্যতামূলক। শচীশচন্দ্র লিখেছেন, "তেত্রিশ বছর একমাস চাকুরী করিবার পর ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে চার্য বুঝাইয়া দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অবসর গ্রহণ করিলেন।"[৩১]

১৮৯০-৯১-এ প্রেসিডেন্সী ডিভিশনের প্রশাসনিক প্রতিবেদনে ২৪ পরগণা জেলার কালেক্টর বললেন, " একজন সম্পূর্ণ উপযুক্ত, যোগ্য ও বিশ্বস্ত ম্যাজিস্ট্রেট; তৎপরতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে ভারী ভারী ফৌজদারী মামলার বিচার করেছেন এবং জনগণকে খুশী করেছেন। তাঁর সম্পর্কে আমি সর্বোচ্চ ধারণা পোষন করি এবং তাঁর অবসরগ্রহণকে জনগণের পক্ষে একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা বলে মনে করি।" কমিশনার মিঃ স্মিথ বললেন, 'ভাল'।

১৮৯১-৯২ এর ২৪ পরগণা জেলার রিপোর্টে কালেক্টর বললেন, "একজন শ্রেষ্ঠ বিচার বিভাগীয় অফিসার।" কমিশনার লিখলেন, "অবসর গ্রহণ করেছেন।" ১৮৯১-এর বিচার বিভাগীয় কাজের রিপোর্ট দিতে গিয়ে ২৪ পরগণার ম্যাজিস্ট্রেট মিষ্টার ই. এন. বেকার লিখেছেন, "খুব ভাল (এক্সেলেন্ট), অবসর গ্রহণ করেছেন।"

ইংরেজ অফিসারদের কাছে বাঙালী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরেরা ছিলেন সরকারের পেটি সারভেন্ট বা সামান্য কর্মচারী। সেখানে চলার নিয়ম ছিল অন্যরকম। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বোধশক্তি ছিল তীক্ষ্ণ, নৈতিক বলও উন্নত। পদ্ধতি ও প্রকরণ মেনে কাজ করার জন্য বারবার তাঁকে সাহেবদের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তিনি শারীরিক ভাবে ছিলেন দুর্বল, সহসা সাহস দেখাতেও পারতেন না। তিনি ঘোড়ায় চড়া শেখেননি। পার্বত্য এলাকাতে চাকরি করেন নি। তিনি পুষ্টিকর খাবার খেতেন।[৩২] কিন্তু ক্রমাগত অপমানে ক্ষতবিক্ষত বঙ্কিমচন্দ্র অবশেষে স্বেচ্ছাবসর গ্রহণ করলেন। ১৮৯২-এ তাঁকে কে. সি. আই ও রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এই উপাধি তাঁর সাহিত্য কীর্তির স্বীকৃতি, কর্ম জীবনের নয়।

ক্রমশ

নীলাভ আকাশে সিঁদুরে মেঘের ছায়া

তপনকান্তি মুখার্জী

EDUCATION is a RIGHT

ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হলো কোনও বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন, নৈতিক ও বৌদ্ধিক গুণাবলির পদ্ধতিগত উন্নতিকরণ আর রাজনীতি হল মানুষের অবস্থার উন্নতি সাধনে ক্ষমতার প্রয়োগ, জনকর্মাবলির বৈজ্ঞানিক পঠন ও অভ্যাস। সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা হলো প্রাতিষ্ঠানিক অক্ষরজ্ঞান আর রাজনীতি হলো মানুষের ওপর গোষ্ঠীবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রপরিচালনার কৌশল এবং কোনো নির্দিষ্ট স্বীকৃত নীতির ভিত্তিতে স্বার্থসংরক্ষণের প্রচেষ্টা। রাজনীতির রাজা কূটনীতিজ্ঞ কৌটিল্য বলেছিলেন, 'মনসা চিন্তয়েৎ কর্ম, বচসা ন প্রকাশয়েৎ।' রাজনীতিকরা যা করবার তা মনে মনে রাখবেন, কথায় কখনও প্রকাশ করবেন না। এইজন্যই বোধহয় মন্ত্রগুপ্তির শপথ নেন মন্ত্রীরা। রাজনীতি উদ্দেশ্যমূলক। রাজনীতিকরা যা বলেন, তা করেন না, আবার যা করেন তা বলেন না। অর্থাৎ রাজনীতি মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর শিক্ষা যা মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতাকে প্রকাশ করে তার ভিত্তি হল সত্য, শিব ও সুন্দর। রাজনীতি বিভাজনে বিশ্বাসী আর শিক্ষা সংকুচিত হওয়ার হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করে, সুতরাং শিক্ষা ও রাজনীতি দুই মেরুর বাসিন্দা। তাদের সহাবস্থান আপাতদৃষ্টিতে সম্ভব নয়। তারা বিপরীতধর্মী।

প্রথম থেকেই তাহলে শুরু হয়ে গেলো স্বপ্নভঙ্গের খেলা। মানুষের তিনটি প্রাথমিক প্রয়োজন—অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের পরই বোধহয় অনুভূত হয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। কোনও দেশের উন্নতি নির্ভর করে শিক্ষিতের হারের ওপর। মানুষ যত বেশি শিক্ষিত হবে ততই তাঁর দৃষ্টি উন্মুক্ত হবে। সামাজিক, আর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্যার দিকে ততো তার দৃষ্টি সঞ্চালিত হবে। সে প্রতিবাদী হয়ে উঠবে। রাজনীতি কি এটা চায়? যদি সমস্ত মানুষ খেতে পায়, পরিধান পায়, মাথাগোঁজার ঠাঁই পায়, শিক্ষা পায় তাহলে রাজনীতির আর দরকার থাকে কি? বোধ হয় না। তা হলেই তো বিপদ। রাজনীতি যা বর্তমানে এক কথায় বিনাপুঁজির লাভজনক ব্যবসা, তাতে তো হস্তচ্যুত হয়ে যাবে। তাই রাজনীতিকরা শিক্ষাকে ঠিক মতো গ্রহণ করতে পারেন না। আবার বর্জনও করতে পারেন না। তাঁদের মধ্যে একটা দোটানার ভাব থাকে, আকর্ষণ-বিকর্ষণ চলতে থাকে। তাই শুরু হয় শিক্ষার রূপপরিবর্তন। চলে ছাত্রছাত্রী গিনিপিগদের ওপর পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ। কখনও ইংরাজি উঠে যায় প্রাথমিক স্তরে, ভুল ভাঙলে আবার তা ফিরে আসে। কখনও ইতিহাস হয়ে যায় বিকৃত, কখনও নিজেদের 'ইজম' সমর্থনে পাঠ্যসূচি হয় রচিত। প্রত্যেকেরই নিজস্ব কিছু মানদন্ড থাকে--শিক্ষারও আছে, রাজনীতিরও আছে। অবশ্য সেই মানদন্ডের কিছু নির্দিষ্ট স্তর আছে। একটি সংস্কৃত শ্লোকে বলা আছে, 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।' তাই রাজনীতি আপন গন্ডির মধ্যেই পূজা পেয়ে সীমাবদ্ধ থাকে, আর শিক্ষার কদর সর্বত্র। এটা একটা সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাপার। কিন্তু যদি কোনোভাবে তার মানহানি ঘটে, ভারসাম্য রক্ষা করা যাবে তো? যায় না, তাই অধঃপতন অনিবার্য। স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজনীতি শিক্ষাঙ্গণে প্রবেশ ক'রে শিক্ষার মানদন্ডে আঘাত হানে। তথাকথিত শিক্ষা চালিত হয় কিছু প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। সেই প্রতিষ্ঠান চালনা করেন কিছু সুশিক্ষিত ব্যক্তি-অন্তত এমনটাই হওয়া উচিত। তাই বহু ভেবেচিন্তে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা-পরিচালক ব্যক্তিদের নির্বাচিত করতে হয়। স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদাধিকারী—যথা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সকলকেই সর্ব অর্থে সুশিক্ষিত হতে হয়। কিন্তু সেখানে নির্লজ্জভাবে খেলা করে রাজনীতির কালো হাত। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রধানরা নিজেদের করণীয় ভুলে রাজনীতির তাঁবেদারি করেন। সরকারে আসীন নেতারাও ভেবে বসেন, টাকার জোগানদার যখন সরকার তখন সব ব্যাপারে মাথা গলানো তো তাঁদের নৈতিক অধিকার ও পবিত্র কর্তব্য। কবির ভাষায়–

"স্বশাসিত কথাটা ঠিক না, ঠিক না / মুখে দাও চাপা, / টাকাকড়ি সবকিছু আমি দি, যদি দি/ রাজা আমি খ্যাপা। / আমিই নিয়ন্ত্রক, আমি আমি আমি /যতই কর না তুমি শোর,/ মুখ বুজে চুপ যাও, চুপ চুপ, চুপ / নইলে একবারে দিয়ে দেবো গোর।"

অতএব শিক্ষার মানহানি হয় এবং হচ্ছে। বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তিদের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছেন স্বল্পশিক্ষিত, অশিক্ষিত রাজনৈতিক দাদারা। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অশিক্ষার ফলে যা হবার তাই হয়। শিক্ষার রাজনীতিকরণ হয়, শিক্ষার মেরুকরণ হয়, শিক্ষার বর্ণিকরণ হয়। সবকিছু হয় শিক্ষার মানহানি ঘটিয়ে। বর্তমান যুগে রাজনীতি মানেই হল মুখে রাজনৈতিক আদর্শবাদের বড়ো বড়ো বুলি কপচানো। জনগণের অবস্থার উন্নতি করার প্রতিজ্ঞা সমৃদ্ধ একটা ভাববাদ সামনে রেখে রাজনীতি খেলা শুরু করে। অর্থাৎ জীবনের প্রকাশ ও বিকাশ। জীবনকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করাই শিক্ষার ধর্ম। জীবনের অলিতে গলিতে শিক্ষার উঁকিঝুঁকি, পদার্পন, পদচারণা। শিক্ষায় রাজনীতির ভাববাদের অনুপ্রবেশ ঘটলেই শিক্ষা নিজস্ব গতিপথ হারিয়ে পথহারা হয়ে অপমৃত্যুর দিকে ছুটে চলে। বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, নিজের ধর্ম হারিয়ে নিম্নগামী হয়।

আমরা বুঝি সবই, কিন্তু করি না কিছুই। জেনেশুনে বিষপান করাটা বোধহয় আমাদের দৈনন্দিন কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কচ্ছপ যেমন বিপদ বুঝলে তার মাথা পা নিজের শক্ত আবরণ খোলের মধ্যে গুটিয়ে রাখে—মেরে ফেললেও মাথা-পা বের করে না, আমরাও তেমনই শুভবুদ্ধি, মনন আমাদের শক্ত মাথার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখি—কোনোকিছুর বিনিময়েই তার স্ফূরণ ঘটাই না। কিন্তু আমাদের সকলের স্বরণে রাখা উচিত, শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। আবার জাতি নিয়ন্ত্রিত হয় রাজনীতির দ্বারা। যে মানুষ প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত নয় সে কখনও রাজনীতির গূঢ় তত্ত্ব ও স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না। রাজনীতি হওয়া উচিত নীতির রাজা, যেখানে বিপরীতধর্মী স্বার্থের স্বীকৃতি ও সহাবস্থান থাকা বাঞ্ছনীয়। 'আমরা ও ওরা'-র বিভাজন যেখানে কাম্য নয়। শিক্ষা যেমন মানুষের মনকে উদার করে তেমনই দেখা উচিত রাজনীতিও যেন সংকীর্ণমনা হয়ে না ওঠে। কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না—এটাই পরিতাপের বিষয়।

এই নেতিবাচক অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে হলে শিক্ষাকে রাজনীতিমুক্ত করতেই হবে। মতের বিভিন্নতা থাকতেই পারে, বিতর্ক হতেই পারে, সেটাই তো স্বাস্থ্যবান সমাজের পক্ষে মঙ্গল। যেখানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে, একে অপরের সমালোচনা করা ও তা সহ্য করার মনোবৃত্তি থাকবে, সেখানে শিক্ষা তো সুগন্ধী ফুল হয়ে সুবাস ছড়াবেই। কিন্তু তা হয় না বলেই রাজনীতিতে শিক্ষিত মানুষ যোগ দিতে আসতে কুণ্ঠাবোধ করেন। অথচ যত বেশি শিক্ষিত মানুষ রাজনীতিতে আসবেন ততো বেশি রাজনীতি পরিশুদ্ধ ও পরিশীলিত হবে। অন্যথা হলে আমরা কোন অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবো কে জানে! তখন কোন্ পথে আসবে আমাদের মুক্তি?

সম্পাদক সমীপেষু

যারা নতুন করে পথ খুঁজে পায়

কিছু সময় আসে যখন অতিরিক্ত পাবার আনন্দে সবকিছু ভুলে যায় এবং তাদের পথটা পাবার আনন্দে সবকিছু ভুলে যায়। তবে এইখানেই সবকিছুর অন্তিম হয়ে যায় না। বরং এখান থেকেই আবার নতুন করে পথ চলার শুরু হয়। তার কারণ অতিরিক্ত পাবার পর অনেক কিছুই ভুলে যায়। যার দরুন একটা বড় রকমের সমস্যা এসে দেখা দেয়। ঠিক তখনই বুঝতে পারে আমাদের অনেককিছুই হারিয়ে যাচ্ছে। যা অনেক কষ্ট করে একসময় সঞ্চয় করেছিলাম। পাবার নেশায় অনেক কিছু আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। তবে সবটুকু হারিয়ে যায় না, যেটুকু থেকে যায় সেটুকু নিয়েই যদি নতুন করে আবার পথটাকে খুঁজে নেওয়া যায়। আবার কিছু ফিরেও পাওয়া যায়। এই জায়গায় চেতনা নামক যে কথাটা রয়েছে, তাকে আবার ব্যবহার করতে হয়। চেতনা থেকেই তো চৈতন্যবোধটা আসে। যখন চৈতন্যবোধটা এসে যায়, আবার সবকিছু ফিরে আসে আগের মতো করে। তবে কোনকিছু পেতে হলে সবার আগে সাধনা করতে হয়। তারপর সাধনা যেদিন সিদ্ধিলাভ করে, দেখা যায় সংসারে তাঁরাই প্রকৃত অর্থে মানুষের পরিষেবা দানে এগিয়ে আসেন। কঠোর সাধনা করলে, কোনদিনই সিদ্ধিলাভ করা যায় না। হাতে কমণ্ডুল নিয়ে আর গায়ে নামাবলি পড়ে, নারায়ণ নারায়ণ করলেও নারায়ণের দেখা পাওয়া যায় না। নারায়ণের সঙ্গে দেখা করতে হলে, মানুষের সাথে থেকে মানুষের সাথে সুম্পর্ক বজায় রেখে মানুষকে ভালোবেসে আপন করে নিতে হয়, তবেই তো নারায়ণের দেখা মেলে। এখানে যে স্বর্গ রয়েছে, সেই স্বর্গের মধ্যেই যে মানুষ রয়েছে, মানুষের কথা যাঁরা ভাবেন তাঁদের দেখা যায় খুব কমই। তাঁরা যে দিন রাত এক করে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ছুটে বেড়ান। এদের চেতনার মধ্যেই চৈতন্যবোধটুকু আছে বলেই মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবার ক্ষমতাও আছে। এরা তো জানে শরীরের নাম মহাশয়, যা শয়াবেন সেটাই এনাদের শয়ে যাবে। এনারা নতুন পথকে খুঁজে পেয়েছিলেন বলেই আজ সেই পথের সাথে নিজেদেরও এগিয়ে নিয়ে যাবার ভাবনাটা এত দৃঢ় ও মজবুত করতে পেরেছেন। চৈতন্য কত প্রয়োজনীয় কথা। স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব বিনোদিনীকে বলেছিলেন, তোর চৈতন্য হোক।

--- প্রবীর মিত্র, হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বাদলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়